বুল্‌বুল

সুর-শিল্পী, বন্ধু

দিলীপকুমার রায়

করকমলেষু

আমার শুধু এ বাণী হে বন্ধু, আমার শুধু এ গান।
তুমি তারে দিলে রূপ-রঙ্গিমা, তুমি তারে দিলে প্রাণ!
আমার ব্যথায় বেঁধেছিল নীড় যে গানের বুলবুলি,
আপনি আসিয়া আদরে তাহারে বক্ষে লইলে তুলি!
আমার পাখির কণ্ঠে মিশালে তোমার দরদ লয়ে,
আমার বেদনা বাজে আজ তাই সবার বেদনা হয়ে।
যে গান গেয়েছি একাকী নিশীথে কুসুমের কানে কানে,
ওগো গুণী, তুমি ছড়াইলে তারে সব বুকে, সব খানে।
বুকে বুকে আজ পেয়েছে আশ্রয় আমার নীড়ের পাখি,
মুক্তপক্ষ উড়িতে যে চায়—কেন তারে বেঁধে রাখি?
তোমার কাননে উড়ে গেল মোর বাগিচার বুলবুলি,
বড় ভীরু সে যে, দোস্ত, তাহারে দস্তে লইও তুলি!

কলিকাতা
১৫ই আশ্বিন
১৩৩৫

তোমার প্রতিভা ও প্রাণমুগ্ধ
নজরুল

'বুলবুলে'র কবি

অমলেন্দু দাশগুপ্ত

ফরাসি জাদুকর আনাতোল ফ্রাঁস ঘটনাটি এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন,—জীবনের সায়াহ্নে বিসমার্ক শহর ছাড়িয়া গ্রামে (Villa-তে) আসিয়া বাস করিতেছিলেন, কর্মক্লান্ত জীবনের শেষ শান্তিকে এখানেই গ্রহণ করিবেন এই আশায়। একদিন ভোরবেলা বৃদ্ধ বিসমার্ক বারান্দায় ইজিচেয়ারে একাকী বসিয়া আছেন। সম্মুখে শ্যাম বনানী, বনের গাছে গাছে তখন কচি পল্লবে সবুজের বান ডাকিয়াছে—বনে বসন্ত আসিয়া পড়িয়াছিল। ভোরের আলো বনের মাথায় মাথায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে—দুই চোখ মেলিয়া তিনি তাহাই দেখিতেছিলেন। ধীরে ধীরে চোখের দুই কোণে দুই ফোঁটা অশ্রু জমিয়া উঠিল। বৃদ্ধ বিসমার্ক বলিয়া উঠিলেন—'হায়, আমার জন্য—শুধু আমারই জন্য ইউরোপের তিন তিনটা যুদ্ধ হল।' স্বর ভাঙিয়া পড়িল, আর্তস্বরে বৃদ্ধ কাঁদিয়া উঠিলেন—'এত অফুরন্ত জীবন আমার গ্রামের, এই বনখানিতে সঞ্চিত রয়েছে, আর আমি হতভাগ্য, এমনি করে জীবন থেকে বঞ্চিত হলাম। Oh, I have lost my life!'

জীবনের শেষদিনে আমি আমার জীবন হারাইয়াছি,—হায়, আমি জীবন হারাইয়াছি—এই বলিয়া বিসমার্ক যে দুই ফোঁটা অশ্রু বিসর্জন করিয়াছিলেন, তার মাঝে তাঁর সমস্ত অগণিত কীর্তি তুচ্ছ হইয়া ডুবিয়া গিয়াছে। দুই ফোঁটা অশ্রুর কাছে বিসমার্কের বাকি সমস্তটা জীবন হার মানিল। বিসমার্ক শেষ হইয়াছেন—তাঁর কর্মকীর্তি ধুলায় ধূসর হইয়াছে—কালের চাকার নিষ্পেষণ সহিবার ক্ষমতা তাদের ছিল না। কিন্তু এই দুই ফোঁটা চোখের জলের সাথে পরমাণু নিয়া মহাকালের লড়াই চলিল—চোখের জলের কাছে মহাকালই একদিন ক্লান্তিতে হাঁটু গাড়িয়া হার মানিবে। অনন্তকালের চোখে এই দুই ফোঁটা জল অশ্রু হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিসমার্ক চোখের দুই ফোঁটা জলে মহাকালকে ভুলাইয়াছেন—আজ চোখের জল অমর হইয়া রহিল। চিরন্তন ক্রন্দসীর ক্রন্দনের অশ্রুমালার এই দুই ফোঁটা জল ফুল হইয়া দুলিয়া রহিল। এমনই হয়—

কাজী নজরুল ইসলাম সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া আনাতোলের এই কথা কেন মনে হইল—তাহাই বলি। নজরুল 'বিদ্রোহী' কবি বলিয়াই পরিচিত। 'বিদ্রোহী'র কবি তিনি—কাজেই তাঁর সৃষ্টি তাঁর বিশেষণ হইয়া তাঁর নামের সঙ্গে আসিয়াছে। সৃষ্টি দিয়াই সৃষ্টিকর্তাকে চিনি। এবং সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টি উভয়কেই আমরা এক সঙ্গে এমনই করিয়া স্মরণ করি। নজরুলকে 'বিদ্রোহী'র কবি না বলিয়া 'বিদ্রোহী' কবি বলাই উচিত কি না সে প্রশ্ন এখানে তুলিতে চাহি না; আমার বক্তব্য স্বতন্ত্র।

'বিদ্রোহী'তে বিসমার্কের মতোই কবি আপন শক্তির নেশায় একদিন মশ্‌গুল হইয়া উঠিয়াছিলেন,—'আমার সমুন্নত শির সৃষ্টির সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া সৃষ্টির বাহিরে বহু বহু ঊর্ধ্বে সীমা হারাইয়া ফেলিয়াছে—যেখানে অস্তিত্ব পর্যন্ত নাই—এত দূরে।'

সৃষ্টিকে ধ্বংস করিয়া যে বিধাতার মাথা ডিঙাইয়া গেল, সে বিদ্রোহী, কিন্তু তবু মানুষের কাছে বড় হইতে পারিল না। কারণ মানুষ জানে যে, এই বিপুল কীর্তির পরমায়ু মহাকালের পলকের ফুৎকারে নিভিয়া যাইবে, অনন্ত দিনের ঝড়-ঝন্‌ঝা সহিবার মতো ক্ষমতা বিদ্রোহীর সমুন্নত কীর্তিস্তম্ভের নাই। বিধাতার সৃষ্টিকে ধ্বংস করিয়া বিধাতার সঙ্গে লড়াই করা চলে, কিন্তু মহাকালের দরবারে তাতে বিন্দুমাত্র বিক্ষোভ ওঠে না। তাই বিদ্রোহীকে বিস্ময়ের চোখেই দেখা যায়, ভয় ও শ্রদ্ধাও যে একটা না থাকে এমন নয়। কিন্তু ভালবাসার মাঝে যে শুচিস্নান না করিয়া আসে সে তো অমর হইতে পারে না।

বিসমার্কের অমর কীর্তি দুই ফোঁটা চোখের জল যেমন তাঁর জীবনের শেষ দিনের প্রতীক্ষায় ছিল, তেমনি কিছু একটা বিদ্রোহীর বিদ্রোহেও যেন চুপ করিয়া ছিল। 'মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরি' এই কথায় তাহার পূর্বাভাস আছে, কিন্তু সম্যক প্রকাশ নাই, কারণ আর এক হাতের রণতূর্যই তখন ভীষণ গুরুগর্জনে বাজিয়া উঠিতেছিল।

বাঁশি নীরব হইয়াই ছিল, কিন্তু বিদ্রোহীর অশান্ত তূর্যের ভৈরব গর্জন বাঁশির বুকের কবর-চাপা ঘুমন্ত সুরে মাঝে মাঝে প্রতিধ্বনি তুলিয়াছে—যেমন আকাশের গুরু গুরু মেঘগর্জন নিশীথনীপ-শাখায় ঘুমন্ত শিখীর কণ্ঠে আচম্‌কা প্রতিধ্বনি তোলে—তেমনি। তাই তো বিদ্রোহীর হাইদরি হাঁকের এক প্রান্তে একটি করুণ অশ্রুমুখী সুরধ্বনিকে দেখিতে পাই, শুনি—

আমি গোপন প্রিয়ার চকিত চাহনি
ছল করে দেখা অনুখন,
আমি চপল মেয়ের ভালবাসা তার
কাঁকন চুড়ির কনকন।

তখনই মন বলে, বিদ্রোহীর রণতূর্যে তোমার সত্যিকার পরিচয় নয়। দেশের, সমাজের জন্য তোমার এই বিদ্রোহের হয়তো অনেকখানিই প্রয়োজন আছে, যেমন আগ্রার দুর্গের একদিন প্রয়োজন ছিল, মুঘল-সাম্রাজ্যের খবরদারি করিবার। কিন্তু মহাকালের কাছে তাহা অকিঞ্চিৎকর, তার প্রচণ্ড চরণপাতে আগ্রার বিশাল দুর্গের মতোই বিদ্রোহী তুমি একদিন ধুলায় রেণু রেণু হইয়া ছড়াইয়া লুপ্ত হইয়া যাইবে। তোমার বাঁশি আছে তার প্রয়োজন নাই সত্য, যেমন তাজমহলের প্রয়োজন নাই, কিন্তু সেই বাঁশিতে যে সুর লুকাইয়া রাখিয়াছ তাহাকে মুক্ত করো, যে সুরের তালে তালে মহাকাল তার প্রেয়সীর জন্য কান্নার গানখানি গাহিবে। বাঁশিই তোমাকে বিসমার্কের চোখের জলের মতো অমর করিবে, তোমাকে তখনই আমরা বড় বলিয়া স্বীকার করিব, যখন তুমি বিদ্রোহের সু-উচ্চ সুর নমিত করিয়া কাঁদিয়া বলিবে—'ওই এক ফোঁটা

শিশু-পল্লবে অনন্ত জীবন সঞ্চিত রয়েছে, ওগো তৃষ্ণাতুর মানব, তুমি তাকে বন্দী করো, তাকে উপেক্ষা করো না; তবে জীবন হারাবে—বঞ্চিত হবে এ জীবনে।' তখন আমরাও বলিব—'ওগো কবি তোমার কণ্ঠে সে সুর বাজে, মহাকালের বীণায় তার অনন্ত প্রতিধ্বনি ওঠে।'

বিশ্বের এই বিচিত্র গন্ধ-বর্ণের অবগুণ্ঠন টানিয়া যে চিরন্তন ক্রন্দসী আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে তাহাকে আবিষ্কার করাই কবির কাজ। নিখিলের এই প্রকাশের যবনিকা উত্তোলন করিলে দেখা যায় যে, এই রূপ-রস-গন্ধের অন্তরালে একটা চিরন্তন কান্নার ফল্গুধারা অনন্তকাল প্রচ্ছন্ন হইয়া বহিতেছে। শ্রেষ্ঠ যে কবি, সে এই অবগুণ্ঠন মুহুর্মুহু উন্মোচন করিতে প্রয়াস পায়—এই সৃষ্টির আড়ালে যে রহিয়াছে, তাহাকে সৃষ্টির সামনে প্রকাশিত করে। কবি হিসাবে কাজী নজরুল এ-দিক দিয়া কতখানি সার্থক হইয়াছেন, তাহাই বিচার করিব।

কথাটা অবান্তর হইলেও না বলিয়া পারিলাম না। একাধারে এমন লাঞ্ছিত ও সমাদৃত, নজরুলের মতো আধুনিক কবিদের মধ্যে অল্পই আছে। কবির কণ্ঠে কুসুমের মালার পরিবর্তে নজরুলের ভাগ্যদোষে তাহা কণ্ঠকেই ভরিয়া আছে, এই কণ্টকমালার প্রতি কণ্টকমুখে যে জ্বালা বিচ্ছুরিত হয়, তাহার দাহে হয় মানুষ মরে, নয় গরলপায়ী নীলকণ্ঠের মতোই অমর হয়। বিধাতা তার সুখ-দুঃখের চাকা মানুষের অদৃষ্টের পথে পর্যায়ক্রমে ঘুরাইয়া নিয়া ফিরিতেছে—যেমন আকাশপথে দিবস-রাত্রি একের পর অপরে পালা করিয়া ঘুরিয়া মরে। দুঃখের চাকা শেষ পাক খাইয়া যখন অদৃশ্য হইবে, সেদিন যে কবির কণ্ঠের কণ্টক-মালার প্রতিটি কাঁটা গোলাপ হইয়া পলকে ফুটিয়া উঠিবে—এ তো মিথ্যা দুরাশা নয়।

কবি নজরুলের লেখায় ফিলজফি নাই—একটা নালিশ তাঁর সম্বন্ধে শোনা যায়। এ অভিযোগ সত্যি হইলে দুঃখ নাই—মিথ্যা হইলে তো কথা থাকে না। তবু কথাটা না থাকাই উচিত। যাহা কবির লেখায় নাই তাহার জন্য তাহাকে অপরাধী করিয়া বড় জোর গালমন্দ দেওয়া যায়, নিন্দা করা যায়; কিন্তু কবিকে চেনা যায় না। যাহা তাঁহার আছে, তাহাই দিয়াই তাঁহাকে চিনিতে হইবে। মরুভূমির কাছে জল চাহিলে সে মরীচিকার ছলনাই করে—পিপাসা মিটায় না। নজরুল কবি, ফিলজফি চাহিলে চলিবে কেন? তাঁর কাছে যাহা চাহিতে হয় তাহা নিয়াই সমালোচনা তো করিতে হইবে।

নজরুলের প্রতি রক্তবিন্দুটি ভালবাসায় রক্তরঙিন। ভালবাসা নিয়া তিনি দর্শনশাস্ত্র রচনা করেন নাই, ব্যথায় গানই গাহিয়াছেন। রামগিরির বিরহী যক্ষ ইচ্ছা করিলে আষাঢ়ের প্রথম মেঘমালার কাছে বিরহের একটা বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক রূপ বর্ণনা করিতে পারিতেন, কিন্তু মেঘের হাতে তাঁর অন্তর-ব্যথা সমর্পণ করিতে পারিতেন না। আজও প্রতি বর্ষ মেঘদূতের হাতে সেই আদিম বিরহীর বিরহলিপি দেখিয়া এত দিন পরেও সভ্যজগতের সুখী মানবও বিমনা হয়। যাক—যাহা বলিতেছিলাম।

নজরুল প্রেমিক কবি। এই ধুলোমাটির তুচ্ছ মানুষের প্রেমই তাঁর সম্পদ। তাঁর সমস্ত কবিতা রক্ত-মাংসের মানুষের ব্যথায় ও কামনায় ভরপুর। সে ব্যথা যে পায় নাই—সেই অরূপ ব্যথার গান বিনাইয়া বিনাইয়া সে গাহে নাই। নিত্যকার মানুষ যে ব্যথা পায়—কাঁদিয়া আকুল হয়—তাহারই ব্যথায় সিন্ধু মথিত করিয়া কবির কাব্য জন্ম নিয়াছে।

সর্বশেষে তাহাই বলি প্রথমেই যে কথা বলা উচিত ছিল নজরুলের লেখার সমালোচনা-প্রসঙ্গে। নজরুল যৌবনের কবি। যৌবনের যে দিকটা খ্যাপা রুদ্রের মতোই ধ্বংস-মাতাল, সেদিকের সাথে কবিকে আমরা যে ডমরু বাজাইতে শুনিয়াছি তাহা অতুলনীয়। দেশের অধীনতা ও সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযান আজ বাংলা সাহিত্যের গর্বের সামগ্রী।

যৌবনের অপর দিক—যেদিকে যৌবনের প্রতি পদক্ষেপে, সৃজনের নব নব শতদল রূপের সঙ্গে অসংখ্য জয়ধ্বনি তুলিয়া সারি বাঁধিয়া ফুটিয়া ওঠে, সে দিকের কথা বলিতে গিয়া প্রথমেই মনে পড়ে বিদ্রোহীর আত্ম-সমর্পণ—

হে মোর রানি, তোমার কাছে
হার মানি আজ শেষে।

বিদ্রোহী শান্ত হইয়াছে, তার রানির কাছে নত হইয়া পরাজয় ভিক্ষা মাগিতেছে। পদতলে নত যৌবন অঙ্গুলি ইঙ্গিতে দেখাইতেছে 'এই সমরজয়ী অমর তরবারি' এই ক্লান্ত মুঠিতে শিথিল হইয়া আসিয়াছে, ওই দেখো বিদ্রোহীর রক্তরথের চূড়ায় তোমার নীলাম্বরী পতাকা হইয়া দুলিতেছে। আমি হার মানি, ওগো রানি, আমি হার মানি। বিদ্রোহী, যৌবনের এই পরাজয়, এই হার মানাই তোমার গলার হার হোক।

এই হার মানার সাথে রবীন্দ্রনাথের 'আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর' কবিতার পরম মিল আছে। সেখানেও যুদ্ধঅস্ত্র ধনুঃশর ফেলিয়া ভূতলে রানির রক্তপদতলে প্রেমিক ভিক্ষা মাগিতেছে—আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর, আমি তব স্বেচ্ছাবন্দী দাস।

এই 'শ্যামলা বিপুল ধরণীর পানে' চাহিয়া কবি মুগ্ধ মনে যে গান গাহিয়াছে, তাহার তুলনা নাই। এই গন্ধ-বরণের যবনিকার অন্তরালে থাকিয়া সে চিরন্তন প্রেয়সী ডাকে—এ হার মানি, তারই জওয়াব।

কবির গানখানি কহিবার আগে আইরিশ কবি ইয়েট্‌সের একটা গ্রাম্য কবিতা মনে পড়িল। মাঠের পথে গ্রাম্য বালা একা গাহিয়া চলিয়াছে—ওগো আমার প্রিয়, আমি তো দিকে দিকে আমার সন্ধান সমেত ছড়াইয়া রাখিয়াছি, তবু তুমি আমার কাছে আসিতে পারিলে না, সে কি আমার অপরাধ? বসন্তের বনভূমিকে জিজ্ঞাসা করো, সে আমার সন্ধান জানে; হেমন্তের গোধূলি-বেলায় আমার সোনার লিখন-পথের সঙ্কেত কহে; বর্ষাদিগন্তের শ্রাবণ-রেখায় দিগবধূ আমারই দেশের পথ দেখায়; ধরণীর তৃণে তৃণে.

আমার সোনার পুরীর অভিমুখে গোপন পথ পড়িয়াছে—তুমি যদি তাহা না জানো, সে কি আমার অপরাধ প্রিয়, সে কি আমার অপরাধ! এই হইল আইরিশ-কবির সে কবিতার মূল সুর!

নজরুলের গানখানি এই—

আমারে চোখ ইশারায় ডাক দিলে হায় কে গো দরদি?
খুলে দাও রঙমহলার তিমির দুয়ার ডাকিলে যদি।

যদি ডাকিলে, তবে নিখিলরানি, তোমার এই বিচিত্র রূপরঙিন তিমির-দুয়ার খোলো, খোলো, রানি, তোমার দুয়ার খোলো। শুনিয়াই রবীন্দ্রনাথের সে কথা মনে পড়ে—'কে দিয়াছে হেন শাপ কেন ব্যবধান?/কেন কাঁদে ঊর্ধ্বে চেয়ে ব্যর্থমনোরথ?' আরও মনে পড়ে রাধিকাকে ক্রোড়ে লইয়া বিরহভিতু কৃষ্ণের কান্না। সেখানেও প্রশ্ন—'কে দিয়াছে হেন শাপ কেন ব্যবধান?'

কবি কাঁদিয়া চলিয়াছে, গুলবাগিচায় চৈতী হাওয়ায় তোমার লিপি পাঠাইয়াছ—সে খবর কহিতে গিয়া কোকিল ডাকিয়া ডাকিয়া চোখদুটি লাল করঞ্জা করিয়া ফেলিল। ওগো আমার দরদি!

পাঠালে ঘূর্ণি-দূতী ঝড়-কপোতী বৈশাখে সখি,
বরষায় সেই ভরসায় মোর পানে চায় জলভরা নদী।

'বরষায় মোর পানে চায় জলভরা নদী'—একটি সুরের টানে কবি অনন্ত দিনের বিরহিণীর যে ছলছল আঁখির ছবি আঁকিয়াছে, এর তুলনা নাই; এ অনবদ্য—অপূর্ব।

কবির গান চলে—

পউষের শূন্য মাঠে একলা বাটে চাও বিরহিণী,
দুহুঁ হায় চাই বিষাদে মধ্যে কাঁদে তৃষ্ণা জলধি।

তোমার আর আমার মাঝে বহিয়া চলিয়াছে হায়, কোন্ অজানা অভিশাপের মতো এই তৃষ্ণার জলধি। মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের কথা—

মিলনের পাত্রটি পূর্ণ যে বিচ্ছেদ বেদনায়;

এই চিরন্তন তৃষ্ণাজলধির ব্যবধান—এই দুস্তর বিরহ কেমন করিয়া পার হই—তখনই মানবাত্মা কাঁদিয়া আকুল হইয়া লুটাইয়া পড়ে—'ওগো, দুহুঁ হায় চাই বিষাদে মধ্যে কাঁদে তৃষ্ণা জলধি।' এই গানের ছোঁয়া লাগিয়া বুকের মাঝে যেন কেমন একটা ব্যথা তির্‌তির্ করিয়া কণ্ঠ পর্যন্ত ফেনাইয়া ওঠে; যাকে পাই নাই কোনো দিন, যাকে হারাই নাই কখনও—তার জন্যই কেমন একটু অবুঝ ব্যথা এমনই সত্য হইয়া উঠে যে, ঊর্ধ্বের তিমির আকাশে দেখি অন্ধকার কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে, দেখি—

তারায় তারায় খোঁজে তৃষ্ণায় আতুর অন্ধকার সঙ্গ সুধারস।

—রবীন্দ্রনাথ

কিন্তু কবি আশ্বাস শুনায়—

ওরে মন, এই ভোরের মলয়ার সাথে বলয় বন্ধন হউক তোমার এই তিমির-দুয়ার চিরবন্ধ রহিবে আর কতকাল?

মানুষ, রক্তমাংসে সে সীমাবদ্ধ মানুষ—এই বোধ যখন তার হয়, তখন সে আবিষ্কার করে যে, বিশ্বের এই অস্তিত্বের পিছনে একটা মর্মান্তিক ব্যথার নদী চিরবহমান—সে ধারা নিয়তির মতোই অমোঘ—দুর্বার নিষ্ঠুর। সে নদীর ছলছল গানের সাথেই সব কবি তাল রাখিয়া তাদের বীণার তার বাঁধে। কাজী নজরুল সে ব্যথা-বারিধির অনন্ত কলধ্বনিকে বুক ভরিয়া আনিয়াছে।

সব কবিরই এই ব্যথাই মূলধন। রবীন্দ্রনাথ এই ব্যথার আঘাতে কাঁদিয়া ধাবমান বলাকার পলাতক পাখার স্পন্দনে আকুল হইয়া কহিলেন—

হেথা নয় হেথা নয়, অন্য কোথা অন্য কোনোখানে।

এই ব্যথার সাধনায় রবীন্দ্রনাথ ঋষির মতোই সত্যদ্রষ্ট হইয়াছেন। পৃথিবীকে এক ক্ষণভঙ্গুর মাটির ভাণ্ড হইতে উর্ধ্বে—বহু উর্ধ্বে অমৃতের সন্ধানে চোখ ফিরাইতে কহিয়াছেন। এ-দিক দিয়া রবীন্দ্রনাথ অপ্রতিদ্বন্দ্বী, বিশ্বকে বিশ্বাতীত আশ্রয়ে পথ দেখাইয়া দিয়াছেন তিনি।

কিন্তু ব্যথার আঘাতে নজরুল এই চোখের জলে সিক্ত সুন্দর ধরণীকে ছাড়িয়া যায় নাই। সে জানে বিরাট মৃত্যুর ভাঙনকূলে সৃষ্টির ঘর। খণ্ড পরমায়ুর আশ্রয়গুলি মুহুর্মুহু হইবে, মৃত্যুর কালো জলের ডাক ঐ শুনা যায়, ততই সে বেশি করিয়া ভালবাসিয়াছে। এই ধূলিমাটির বেদনার বন্ধনকে আরও সবলে জড়াইয়া ধরিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের ব্যথায় উদাসীন বৈরাগীর নির্লিপ্ত নির্বিকার শান্তির আভাস আছে; কিন্তু নজরুলের ব্যথায় মৃত্যুশীতল মানুষের হারাইবার বেদনা, পাইয়া না রাখিতে পারার জ্বালা আছে। ব্যথা সে পাইয়াছে—ইহাই তাহার কাছে সত্য, তাই ধরণীর গাত্রে আর কোনো সান্ত্বনার মিথ্যা আবরণ সে পরায় নাই।

রবীন্দ্রনাথ—'বেলা যে পড়ে এল জলকে চল' কবিতায় একটা ব্যথাতুর মানবাত্মার মুক্তি-কান্নাকে বাঁধিয়া দিয়াছেন। কিন্তু এই কান্নার অন্তরালে একটা বিবাগী বাউল যে আপন মনে অতি সঙ্গোপনে একতারা বাজাইয়া চলিয়াছে—তাহা যেন আভাসের মতো টের পাওয়া যায়। 'কবে ফুরাবে সব খেলা জানিস্ যদি বল' শেষের মধ্যে নিজের এই ব্যথার একটা সমাপ্তি রবীন্দ্রনাথ চাহিয়াছেন—নিজকে শেষের একটা রূপহীন কায়াহীন নির্বিকার শান্তির ছোরা দিয়া ব্যথাকে হত্যা করিয়াছেন।

নজরুল প্রকৃতিতে রবীন্দ্রনাথ হইতে স্বতন্ত্র—একটা শেষের সন্ধান যে চাহে নাই। ব্যথা তার এত প্রবল যে শেষকে পর্যন্ত কামনা করিবার অবকাশ থাকে না। সে এই ব্যথামাখা প্রেমিকের চোখে পৃথিবীকে দেখিয়াছে—আর দেখিয়াই চলিয়াছে। নিম্নের সন্ধ্যার এই গানখানিতে 'বেলা যে পড়ে এল জলকে চল'—সে সুরও আছে, নারীর

যৌবন-জোয়ারের পানি না ফিরে গো আর, যৌবনের এই আসন্ন ভাঁটার ভীতি আছে, সঙ্গে সঙ্গে প্রেমিকের বেদনা আছে। অবশ্য কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের 'বধূ' কবিতার সাথে একই স্তরে রাখিয়া বিচার করা চলে না—কারণ দুটি দু'ধরনের কবিতা।

এই কবিতার সুর একটি নিরবচ্ছিন্ন সুর নহে। কোন্ খেয়ালি অসাবধানে বিরহ মিলনের তার দুটির সাথে বৈরাগ্যের একটু রেশ জড়াইয়া রাখিয়া গিয়াছে যে, ছড় চালাইলেই একটা অপূর্ব কান্না হৃদয়ের রন্ধ্রে মোচড় খাইয়া ওঠে, কবি কহে—

বসিয়া বিজনে কেন একা মনে
পানিয়া ভরনে চলো লো গোরী।

তারপরে যে সুরটুকু আসে, তাহা যে ওই একাকিনীর ব্যথাটুকুই শুধু আনে, তা নয়, এই মূক বোবা প্রকৃতির সাথে ব্যথাতুর মানবাত্মার কথার যে কানাকানি চলে, সে খবরটুকুও আনে। তাই শুনি—

চল জলে চল কাঁদে বনতল
ডাকে ছলছল জললহরী।

ব্যথা এত নিবিড় হয় যে, বনতলে কান্না শুনা যায়—তার জন্য যে গাগরি কাঁখে জলকে এই পথে যাইবে। গাঁয়ের নদীটি পর্যন্ত আঙ্গিনায় নীরব বধূটিকে বেলাশেষের সুরে ডাকে—ওগো, বেলা যে যায়, জলকে এস। ব্যথা কত একান্ত হইলে সন্ধ্যার বনতল ও নদীতরঙ্গে তাহা বিলানো চলে—তাহাই ভাবি।

তারপর কবি সন্ধ্যার যে ছবি দিয়াছে তাহা সত্যই রক্তমাংসের মানুষের ব্যথায় ও বেদনায় পুঞ্জিত। কবি 'দিবা অবসান হলো' বলিয়া পূরবীর ম্লান বৈরাগ্য রাগিণী গাহে নাই। কিংবা—

ওই যেথা জ্বলে সন্ধ্যার কূলে
দিনের চিতা

বলিয়া একটা সীমাহীন মনের আবেগহীন নির্লিপ্ত মহান উদাসীনতাও প্রকাশ করে নাই।

কবি কহিল—

দিবা চলে যায় বলাকা-পাখায়
বিহগের বুকে বিহগী লুকায়,
কেঁদে চখাচখি মাগিছে বিদায়
বারোয়াঁর সুরে ঝুরে বাঁশরি।

সন্ধ্যার সমস্ত ছবি কবি বাদ দিল। নির্জন আঙিনায় একাকিনী যে বসিয়া আছে তাকে গিয়া কহিল,—'দিবা চলিয়া যাইতেছে ; সখি, বিহগের বুকে বিহগি লুকায়, চখাচখি কাঁদিয়া রাত্রির মতো বিদায় লইতেছে।' আর কোনো কথা না কহিবার অর্থ কি? অন্য সমস্ত কথা বাদ দিয়া এই খবর দিবার মাঝেই কবির বিশেষত্ব। সন্ধ্যার ছবি ধীরে ধীরে চোখের উপর ভাসিয়া ওঠে। আর সবচেয়ে বড় কথা এই, যে 'বিজনের একাকিনীকে'

কেন একা চুপ করিয়া বসিয়া আছে, 'জলকে যাবে না' বলিয়া প্রশ্ন করা হইয়াছিল, সন্ধ্যায় তার অন্তর-ব্যথা এই দুইটি ছবির মাঝে ধরা দিয়াছে—'কেন' প্রশ্নের উত্তরও দেওয়া হইয়াছে।

সন্ধ্যার এই ছবি চয়নে যে কৃতিত্ব কবি দেখাইয়াছে তাহা অনিন্দনীয়। সেই একই মনোভাব ও রুচি ছবি সংগ্রহ করিয়া চলিয়াছে—

সাঁঝ হেরে মুখ চাঁদ-মুকুরে
ছায়াপথ-সিঁথি রচি চিকুরে,

রসের দিক দিয়াই যে শুধু অপূর্ব তা নয়, বর্ণনার দিক দিয়াও এই কয় ছত্র সাহিত্যে অপূর্ব। তার পরে পাই—

নাচে ছায়া-নটী কানন-পুরে,
দুলে লটপট লতা-কবরী।

এখানেও চিত্র-নির্বাচনে প্রেমিক-মনের সেই সূক্ষ্মতার আভাস পাই। 'ছায়া-নটী' ও 'লতা-কবরী' শব্দ দুইটির সাহায্যেই কবি বিচিত্র একটি প্রেমাতুর সন্ধ্যার ছবি চোখের সামনে ধরিয়া দিয়াছে; হয়তো দিনান্তে আঙিনার খুঁটি ধরিয়া আসন্ন অভিসারিকা রাধাও একদিন সন্ধ্যার বনতলের পানে চাহিয়া এই দৃশ্যই দেখিয়াছিলেন। সেই ছবি আরও প্রসারিত হয়—

'বেলা গেল বধূ' ডাকে ননদী
চল জল নিতে যাবি লো যদি,
কালো হয়ে আসে সুদূর নদী

'বেলা গেল বধূ' এবং 'চল জল নিতে যাবি লো যদি'—ননদীর এই ডাকে মন কোন্ স্মরণাতীত অতীতের সন্ধ্যার সামনে গিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়ায়, যখন সে দেখে—

নাগরিকা সাজে সাজে নগরী

শুধু ইহাই নয়। এই 'ননদী' শব্দ এবং 'চল জল নিতে যাবি লো যদি' শব্দে গাঁয়ের শান্ত নম্র সন্ধ্যাটি চোখের উপর অনাড়ম্বর মহিমায় ফুটিয়া ওঠে; পল্লীর মুদিত দিবসের সন্ধ্যার শান্তিখানি যেন মনকে আসিয়া স্পর্শ করে। সম্মুখে অবসন্ন রজনীর অন্তরালে 'যেন ভিনগাঁর ভীরু মেয়ের' অভিসার-পদধ্বনি শুনিতে পাই।

'কালো হয়ে আসে সুদূর নদী'—এই ছত্রটির ব্যাখ্যা অসম্ভব। ইহা এমন একটি ভাবকে মনের মনে অনুভূতির মতো শিহরন তোলে যে, ভাষার আহরণে তাহাকে রূপ দিয়া বাহু বাড়াইয়া সম্মুখে আনা যায় না। অতি সুকুমার অনুভূতির ন্যায় মনের সর্বাঙ্গ পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে, যেমন শান্তনিশীথে নিস্তরঙ্গ সিন্ধুর বুকে একটা নিরবচ্ছিন্ন 'ও-

ও-ও-ম' ধ্বনি কূল হইতে কূলে প্রসারিত হইতে থাকে। কালো হয়ে আসে সুদূর নদী—কম কবির কলমেই এমন অপূর্ব মায়া সৃষ্টি ধরা দেয়। সৌভাগ্যের মতোই ইহা কদাচিৎ আসে।

এই সন্ধ্যার গানের শেষ হইল—

কারে ভেবে বেলা কাঁদিয়া কাটে
ভর আঁখিজলে ঘটগাগরী।

অনেক কিছু লিখিবার ছিল। আমি শুধু আর দুই স্থান হইতে তুলিয়া ক্ষান্ত হইব। ব্যথিতার গান—

কেন কাঁদে পরান কী বেদনায় কারে কহি,
সদা কাঁপে ভীরু হিয়া রহি রহি।

যাকে চাই, তার জন্য ব্যথা ও কামনাকে কেমন করিয়া বাহিরের বিশ্ব আমাদের বুক হইতে লুণ্ঠন করিয়া লয় তাহা দেখিবার বস্তু বটে। এ যেন 'পঞ্চশরে দগ্ধ করে বিশ্বময়' ছড়াইয়া দেওয়ার মতো। তাই তো বিরহিণী ব্যথা এমন করিয়া নালিশ করে, নিজের অক্ষমতা জানায়—

সে থাকে নীল নভে আমি নয়ন-জল সায়রে,
সাতাশ তারার সতীন সাথে সে যে ঘুরে মরে,
কেমনে ধরি সে চাঁদে রাহু নহি।

কবি যাকে ভালবাসে, সে গোপন পায়ে বকুল ছায়ে যাতায়াত করে। সেই—

ঊষার রাগে সাঁঝের ফাগে
যুগল তাহার কপোল রাঙে
কমল দুলে সূরয্ শশী
নিশীথ চলে আঁধার রাশে।

সূর্যকে প্রেয়সীর খোঁপার ফুল করিয়া গুঁজিয়া দেওয়া কি-যে বিশ্বগ্রাসী তাই ভাবি। এই প্রেমিকই একদিন কহিয়াছিল—

সখি, মদনের বাণ হানা শব্দ শুনিস,
ও যে বিষমাখা মিশকালো দোয়েলার শিস।

সখি, তুমি বুঝি কান পাতিয়া মদনের বাণহানার শব্দ শুনিতেছ? ও তো বাণ নয়, ও যে কালো দোয়েলের শিস সই, ও মদনের বাণহানা শব্দ নয়; সখি, তোমার ভুল, বন-মর্মরে শ্রীপতির পদধ্বনি বলিয়া ধ্রুবের যেমন ভুল হইয়াছিল তেমনই ভুল।

উপরিউক্ত দুই লাইনের তুলনা বাংলাতে কেন, যে-কোনো সাহিত্যেই হোক, অল্পই আছে—এ অতি দুঃসাহসিকের উক্তি হইতে পারে কিন্তু মিথ্যাবাদীর মিথ্যা ভাষণ নয় এ, তা জানি।

কবি বিশ্বরানিকে কহিতেছে। যার কেশে রবি শশীর কমলকলি, অলক খোঁপায় গ্রহের মালা, সাঁঝের শাখায় কানন মাঝে যার বিহগ-কাঁকন বাজে তাঁকেই কবি মিনতি করিয়া কহিতেছে—

তোমার 'লীলা-কমল' করে
নিখিল রানি, দুলাও মোরে।

এ ভক্তের নিবেদন নয়—এ প্রেমিকের আবেদন—

দুলাও আমার সুবাসখানি
তোমার মুখের মদির-শ্বাসে।

বাংলায় গজলের বহুল প্রচার সম্বন্ধে আমি অজ্ঞ নহি। তবু কবির বিদ্বেষীদের বলিতে চাই, বিদ্বেষ ও ঘৃণায় কান বন্ধ করিবেন না। তাদের কাননে যে বুল্‌বুলি উড়িয়া গেল, সে যে বড় ভীরু। দোস্তের মতো আদরে বুকে লইতে না পারিলে বাগিচার মালিকের অপরাধে তার বুল্‌বুলির কণ্ঠ চাপিয়া নির্দয় হত্যা করিবেন না। একবার বুল্‌বুলের কণ্ঠ-শিসে গজল শুনুন। তারপর যদি ভাল না লাগে তবে সেই বুল্‌বুলই বন্ধু, তোমাকে এই বলিয়া আদাব জানাইবে—

স্বপনের স্মৃতি প্রিয়,
জাগরণে ভুলিও.
ভুলে যেও দিবালোকে
রাতের এই আলেয়ারে!

১

ভৈরবী—কাহারবা

বাগিচায় বুল্‌বুলি তুই ফুল্‌শাখাতে
দিস্‌নে আজি দোল্‌।
আজো তার ফুলকলিদের ঘুম টুটেনি
তন্দ্রাতে বিলোল্‌॥

আজো হায় রিক্ত শাখায় উত্তরী-বায়
ঝুর্‌ছে নিশিদিন,
আসেনি দখ্‌নে হাওয়া গজল গাওয়া
মৌমাছি বিভোল্‌॥

কবে সে ফুল-কুমারী ঘোম্‌টা চিরি
আসবে বাহিরে,
শিশিরের স্পর্শসুখে ভাঙবে রে ঘুম
রাঙবে রে কপোল॥

ফাগুনের মুকুল-জাগা দুকূল-ভাঙা
আসবে ফুলেল বান,
কুঁড়িদের ওষ্ঠপুটে লুটবে হাসি,
ফুটবে গালে টোল॥

কবি তুই গন্ধে ভুলে ডুবলি জলে
কূল পেলিনে আর,
ফুলে তোর বুক ভরেছিস আজকে জলে
ভরবে আঁখির কোল॥

২

জৌনপুরী-আশাবরী—কাহারবা

আমারে চোখ-ইশারায় ডাক দিলে হায় কে গো দরদী।
খুলে দাও রঙ-মহলার তিমির-দুয়ার ডাকিলে যদি॥

গোপনে চৈতী হাওয়ায় গুল্-বাগিচায় পাঠালে লিপি,
দেখে তাই ডাকছে ডালে কু কু বলে কোয়েল ননদী॥

পাঠালে ঘূর্ণি-দূতী ঝড়-কপোতী বৈশাখে সখি,
বরষায় সেই ভরসায় মোর পানে চায় জল-ভরা নদী॥

তোমারি অশ্রু ঝলে শিউলি-তলে সিক্ত শরতে,
হিমানীর পরশ বুলাও ঘুম ভেঙে দাও দ্বার যদি রোধি॥

পউষের শূন্য মাঠে একলা বাটে চাও বিরহিণী,
দুহুঁ হায় চাই বিষাদে মধ্যে কাঁদে তৃষ্ণা-জলধি॥

ভিড়ে যা ভোর-বাতাসে ফুল-সুবাসে রে ভোমর-কবি,
ঊষসীর শিশ-মহলে আসতে যদি চাস নিরবধি॥

৩

ইমন-মিশ্র গজল—কাহারবা

বসিয়া বিজনে কেন একা মনে
পানিয়া ভরণে চল লো গোরী।
চল জলে চল কাঁদে বনতল,
ডাকে ছলছল জল-লহরী॥

দিবা চলে যায় বলাকা-পাখায়,
বিহগের বুকে বিহগী লুকায়!
কেঁদে চখা-চখি মাগিছে বিদায়
বারোয়াঁর সুরে ঝুরে বাঁশরি॥

সাঁঝ হেরে মুখ চাঁদ-মুকুরে
ছায়াপথ-সিঁথি রচি চিকুরে,
নাচে ছায়া-নটী কানন-পুরে
দুলে লটপট লতা-কবরী॥

'বেলা গেল বধূ' ডাকে ননদী,
চল জল নিতে যাবি লো যদি,
কালো হয়ে আসে সুদূর নদী,
নাগরিকা-সাজে সাজে নগরী ॥

মাঝি বাঁধে তরী সিনান-ঘাটে,
ফিরিছে পথিক বিজন মাঠে,
কারে ভেবে বেলা কাঁদিয়া কাটে
ভর আঁখি-জলে ঘট গাগরী ॥

ওগো বে-দরদী, ও রাঙা পায়ে
মালা হয়ে কে গো গেল জড়ায়ে !
তব সাথে কবি পড়িল দায়ে
পায়ে রাখি তারে না গলে পরি ॥

৪

পিলু-কাহারবা—দাদ্‌রা

ভুলি কেমনে আজো যে মনে
বেদনা-সনে রহিল আঁকা
আজো সজনী দিন রজনী
সে বিনে গণি তেমনি ফাঁকা ॥

আগে মন করলে চুরি
মর্মে শেষে হানলে ছুরি,
এত শঠতা এত যে ব্যথা
তবু যেন তা মধুতে মাখা ॥

চকোরী দেখলে চাঁদে
দূর হতে সই আজো কাঁদে,
আজো বাদলে ঝুলন ঝোলে
তেমনি জলে চলে বলাকা ॥

বকুলের তলায় দোদুল
কাজলা মেয়ে কুড়োয় লো ফুল,
চলে নাগরী কাঁখে গাগরী
চরণ ভারি কোমর বাঁকা॥

তরুরা রিক্ত-পাতা
আসল লো তাই ফুল-বারতা,
ফুলেরা গলে ঝরেছে বলে
ভরেছে ফলে বিটপি-শাখা॥

ডালে তোর হানলে আঘাত
দিস রে কবি ফুল-সওগাত,
ব্যথা-মুকুলে অলি না ছুঁলে
বনে কি দুলে ফুল-পতাকা॥

৫

মিশ্র বেহাগ-খাম্বাজ—দাদ্‌রা

কেন কাঁদে পরান কী বেদনায় কারে কহি।
সদা কাঁপে ভীরু হিয়া রহি রহি॥

সে থাকে নীল নভে আমি নয়ন-জল-সায়রে
সাতাশ তারার সতিন-সাথে সে যে ঘুরে মরে,
কেমনে ধরি সে চাঁদে রাহু নহি॥

কাজল করি যারে রাখি গো আঁখি-পাতে,
স্বপনে যায় সে ধুয়ে গোপন অশ্রু-সাথে !

বুকে তায় মালা করি রাখিলে যায় সে চুরি,
বাঁধিলে বলয়-সাথে মলয়ায় যায় সে উড়ি
কি দিয়ে সে উদাসীর মন মোহি॥

৬

সিন্ধু-ভৈরবী—কাহারবা

মৃদুল বায়ে বকুল ছায়ে
গোপন পায়ে কে ঐ আসে,
আকাশ-ছাওয়া চোখের চাওয়া
উতল হাওয়া কেশের বাসে॥

ঊষার রাগে সাঁঝের ফাগে
যুগল তাহার কপোল রাঙে,
কমল দুলে সূরয্ শশী
নিশীথ-চুলে আঁধার-রাশে॥

চরণ-ছোঁওয়ায় পাতার ঠোঁটে
মুকুল কাঁপে কুসুম ফোটে,
আঁখির পলক- পতন-ছাঁদে
নিশীথ কাঁদে দিবস হাসে॥

গ্রহের মালা অলখ-খোঁপায়,
কপোল শোভে তারার টোপায়,
কুসুম-কাঁটায় আঁচল-বাধে
রুমাল লুটায় সবুজ ঘাসে॥

সাঁঝের শাখায় কানন মাঝে
বালার বিহগ- কাঁকন বাজে,
জীবন তাহার সোনার স্বপন
দোলায় ঘুমায় শিশুর পাশে॥

তোমার লীলা- কমল করে
নিখিল-রানি ! দুলাও মোরে।
ঢুলাও আমার সুবাসখানি
তোমার মুখের মদির-শ্বাসে॥

৭

ভৈরবী-আশাবরী—কাহারবা

কে বিদেশি বন-উদাসী
বাঁশের বাঁশি বাজাও বনে।
সুর-সোহাগে তন্দ্রা লাগে
কুসুম-বাগের গুল-বদনে॥

ঝিমিয়ে আসে ভোমোরা-পাখা,
যুঁথির চোখে আবেশ মাখা,
কাতর ঘুমে চাঁদিমা রাকা
(ভোর গগনের দর-দালানে)
দর-দালানে ভোর গগনে॥

লজ্জাবতীর লুলিত লতায়
শিহর লাগে পুলক-ব্যথায়,
মালিকা সম বঁধুরে জড়ায়
বালিকা-বধূ সুখ-স্বপনে॥

সহসা জাগি আধেক রাতে
শুনি সে বাঁশি বাজে হিয়াতে,
বাহু-শিথানে কেন কে জানে
কাঁদে গো পিয়া বাঁশির সনে॥

বৃথাই গাঁথি কথার মালা
লুকাস কবি বুকের জ্বালা,
কাঁদে নিরালা বন্‌শিওয়ালা
তোরি উতলা বিরহী মনে॥

৮

সিন্ধু—কাওয়ালি

করুণ কেন অরুণ আঁখি
দাও গো সাকি দাও শারাব।

হায় সাকি এ আঙ্গুরি খুন,
নয় ও হিয়ার খুন-খারাব ॥

দুর্দিনের এই দারুণ দিনে
শরণ নিলাম পান-শালায়,
হায় সাহারার প্রখর তাপে
পরান কাঁপে দিল্‌-কাবাব ॥

আর সহে না দিল্‌ নিয়ে এই
দিল্‌-দরদির দিল্‌লগি,
তাই তো চালাই নীল পেয়ালায়
লাল শিরাজী বে-হিসাব ॥

এই শারাবের নেশার রঙে
নয়ন-জলের রঙ লুকাই,
দেখছি আঁধার জীবন ভরি
ভর-পিয়ালার লাল খোয়াব ॥

আমার বুকের শূন্যে কে গো
ব্যথার তারে ছড়্‌ চালায়,
গাইছি খুশির মহফিলে গান
বেদন-গুণীর বীণ্‌ রবাব্‌ ॥

হারাম কি এই রঙিন পানি,
আর হালাল এই জল চোখের?
নরক আমার হউক মঞ্জুর,
বিদায় বন্ধু, লও আদাব ॥

দেখ রে কবি, প্রিয়ার ছবি
এই শারাবের আর্শিতে,
লাল গেলাসের কাচ্‌-মহলার
পার হতে তার শোন্‌ জওয়াব ॥

৯

মন্দ্—কাওয়ালি

এত জল ও-কাজল-চোখে
পাষাণী, আনলে বলো কে।
টলমল জল-মোতির মালা
দুলিছে ঝালর-পলকে॥

দিল কি পুব্-হাওয়াতে দোল্,
বুকে কি বিঁধিল কেয়া?
কাঁদিয়া কুটিলে গগন
এলায়ে ঝামর-অলকে॥

চলিতে পৈঁচি কি হাতের
বাধিল বেঁচি কাঁটাতে?
ছাড়াতে কাঁচুলির কাঁটা
বিঁধিল হিয়ার ফলকে॥

যে দিনে মোর দেওয়া-মালা
ছিঁড়িলে আনমনে সখি,
জড়াল জুঁই-কুসুমি-হার
বেণীতে সেদিন ওলো কে॥

যে-পথে নীর ভরণে যাও
বসে রই সেই পথ-পাশে,
দেখি, নিত্ কার পানে চাহি
কলসির সলিল ছলকে॥

মুকুলী মন সেধে সেধে
কেবলি ফিরিনু কেঁদে,
সরসীর ঢেউ পলায় ছুটি
না ছুঁতেই নলিন্-নোলকে॥

বুকে তোর সাত সাগরের জল,
পিপাসা মিটল না কবি,
ফটিক-জল! জল খুঁজিস যেথায়
কেবলি তড়িৎ ঝলকে॥

১০

ভীমপলশ্রী—দাদরা

আসে বসন্ত ফুলবনে
সাজে বনভূমি সুন্দরী।
চরণে পায়েলা রুমুঝুমু
মধুপ উঠিছে গুঞ্জরি॥

ফুলরেণু-মাখা দখিনা বায়
বাতাস করিছে বন-বালায়,
বন-কবরী-নিকুঞ্জ-ছায়
মুকুলিকা ওঠে মুঞ্জরি॥

কুহু আজি ডাকে মুহুমুহু,
'পিউ কাঁহা' কাঁদে উহু উহু
পাখায় পাখায় দোঁহে দুহুঁ
বাঁধে চঞ্চর চঞ্চরী॥

দুলে আলো-ছায়া বন-দুকূল,
ওড়ে প্রজাপতি কল্‌কা ফুল,
কর্ণে অতসী স্বর্ণ-দুল
আলোক-লতার সাত-নোরী॥

পদ্ম ডলিয়া পায়ে বালা
করিয়াছে সারা বন আলা,
দ্বারে মঞ্জরী-দীপ জ্বালা,
ডালপালা রচে ফুলছড়ি॥

কবি, তোর ফুল-মালি কেমন,
ফাগুনে শূন্য পুষ্পবন,
বরিবি বঁধুরে এলে কানন
রিক্ত হাতে কি ভুল ভরি॥

১১

কাফি-সিন্ধু—কাহারবা

দুরন্ত বায়ু পুরবইয়াঁ
বহে অধীর আনন্দে।
তরঙ্গে দুলে আজি নাইয়াঁ
রণ-তুরঙ্গ-ছন্দে॥

অশান্ত অম্বর-মাঝে
মৃদঙ্গ গুরুগুরু বাজে,
আতঙ্কে থরথর অঙ্গ
মন অনন্তে বন্দে॥

ভুজঙ্গী দামিনীর দাহে
দিগন্ত শিহরিয়া চাহে,
বিষণ্ন ভয়-ভীতা যামিনী
খোঁজে সেতারা চন্দে॥

মালঞ্চে এ কি ফুল-খেলা
আনন্দে ফোটে যূথি বেলা,
কুরঙ্গী নাচে শিখী-সঙ্গে
মাতি কদম্ব-গন্ধে॥

একান্তে তরুণী তমালী
অপাঙ্গে মাখে আজি কালি,
বনান্তে বাঁধা প'ল দেয়া
কেয়া-বেণীর বন্ধে॥

দিনান্তে বসি কবি একা
পড়িস কি জলধারা-লেখা,
হিয়ায় কি কাঁদে কুহু-কেকা
আজি অশান্ত দ্বন্দ্বে॥

১২

বাগেশ্রী-পিলু—কাহারবা

চেয়ো না সুনয়না
আর চেয়ো না এ নয়ন পানে।
জানিতে নাইকো বাকি
সই ও আঁখি কী জাদু জানে॥

একে ঐ চাউনি বাঁকা
সুর্মা-আঁকা, তায় ডাগর আঁখি।
বধিতে তায় কেন সাধ
যে মরেছে ঐ আঁখি-বাণে॥

কাননে হরিণ কাঁদে,
সলিল-ফাঁদে ঝুরছে শফরি,
বাঁকায়ে ভুরুর ধনু
ফুল-অতনু কুসুম-শর হানে॥

কুনাল কি পড়ল ধরা !
পীযূষ-ভরা ঐ চাঁদো মুখে,
কাঁদিছে নার্গিসের ফুল
লাল কপোলের কমল-বাগানে॥

জ্বলিছে দিবস রাতি
মোমের বাতি রূপের দেওয়ালি,
নিশিদিন তাই কি জ্বলি
পড়ছ গলি অঝোর নয়ানে॥

মিছে তুই কথার কাঁটায়
সুর বিঁধে হায় হার গাঁথিস কবি,
বিকিয়ে যায় রে মালা
আয় নিরালা আঁখির দোকানে॥

১৩

পিলু-দাদরা

পরান-প্রিয় ! কেন এলে অবেলায়।
শীতল হিমেল বায়ে ফুল ঝরে যায়॥

সেদিনো সকালবেলা
খেলেছি কুসুম-খেলা,
আজি যে কাঁদি একেলা
এ ভাঙা মেলায়,
কেন এলে অবেলায়॥

ক্লান্ত দিবস দুরে
কাঁদিছে পিলুর সুরে,
কেন শত পথ ঘুরে
আসিলে হেথায়॥

১৪

ভৈরবী—খং

সখি জাগো, রজনী পোহায়।
মলিন কামিনী-ফুল যামিনী-গলায়॥

চলিছে বধূ সিনানে
বসন না বশ মানে,
শিথিল আঁচল টানে
পথের কাঁটায়॥

১৫

ভৈরবী—কাহারবা

নিশি ভোর হলো জাগিয়া
পরান-পিয়া।

কাঁদে 'পিউ কাহাঁ' পাপিয়া
পরান-পিয়া ॥

ভুলি বুল্‌বুলি-সোহাগে
কত গুল্‌বদনী জাগে,
রাতি গুল্‌সনে যাপিয়া
পরান-পিয়া ॥

জেগে রয় জাগার সাথী
দূরে চাঁদ, শিয়রে বাতি,
কাঁদি ফুল-শয়ন পাতিয়া,
পরান-পিয়া ॥

কত আর সাজাব ডালা,
বাসি হয় নিতি যে মালা,
কত দূর যাব ভাসিয়া,
পরান-পিয়া ॥

গেয়ে গান চেয়ে কাহারে
জেগে রস্ কবি এপারে
দিলি দান কারে এ হিয়া,
পরান-পিয়া ॥

১৬

বৃন্দাবনী সারঙ্গ মিশ্র—দাদ্‌রা

এ বাঁসি বাসরে আসিলে কে গো ছলিতে।
কেন পুন বাঁশি বাজালে কাফি ললিতে ॥

নিশীথ গভীরে
কেন আঁখি-নীরে
এলে ফিরে ফিরে
গোপন কথা বলিতে ॥

দলিত কুসুম-দলে রচিয়াছি শয়ন
অন্ধ তিমির রাতি, নিবু-নিবু নয়ন !

মরণ-বেলায় প্রিয়
আনিলে কি অমিয়
এলে কি গো নিঠুর
ঝরা ফুল দলিতে॥

১৭

কালাংড়া—কাওয়ালি

বসিয়া নদীকূলে এলোচুলে
কে উদাসিনী।
কে এলে পথ ভুলে
এ অকূলে বন-হরিণী॥

কলসে জল ভরিয়া চায়
করুণায় কুলবধূরা,
কেঁদে যায় ফুলে ফুলে
পদমূলে সাঁঝ-তটিনী॥

নিশিদিন চাহি তোমারে
ওপারে বাজিছে বাঁশি,
এপারে বাজে বধূর
মল-নূপুর মধু-ভাষিণী॥

আকাশে মেলিয়া আঁখি
লেখা কি পড়িছ পিয়ার,
কে গো সে রূপ-কুমার
তুমি গো যার অনুরাগিণী॥

দলিয়া কত ভাঙা মন
ও চরণ করেছ রাঙা,
কাঁদায়ে কত না দিল্
এলে নিখিল-মনোমোহিনী॥

হারালি গোধূলি-লগন,
কবি, কোন্ নদী-কিনারে,
একি সেই স্বপন-চাঁদ
পেতেছে ফাঁদ প্রিয়ার সতিনী॥

১৮

বেহাগ—দাদ্‌রা

কেন দিলে এ কাঁটা
যদি গো কুসুম দিলে
ফুটিত না কি কমল
ও কাঁটা না বিঁধিলে॥

কেন এ আঁখি-কূলে
বিধুর অশ্রু দুলে,
কেন দিলে এ হৃদি
যদি না হৃদয় মিলে॥

শীতল মেঘ-নীরে
ডাকিয়া চাতকীরে
নীর ঢালিতে শিরে
বাজ কেন হানিলে॥

যদি ফুটালে মুকুল
কেন শুকাইলে ফুল,
কেন কলঙ্ক-টিপে
চাঁদের ভুরু ভাঙিলে॥

কেন কামনা-ফাঁদে
রূপ-পিপাসা কাঁদে,
শোভিত না কি কপোল
ও কালো তিল নহিলে॥

কাঁটা-নিকুঞ্জে কবি
এঁকে যা সুখের ছবি,
নিজে তুই গোপন রবি,
তোরি আঁখির সলিলে॥

১৯

বিহারী খাম্বাজ মিশ্র—দাদরা

সখি, বলো বঁধুয়ারে নিরজনে।
দেখা হলে রাতে ফুলবনে॥

কে করে ফুল চুরি জেনেছে ফুলমালি,
কে দেয় গহীন রাতে ফুলের কূলে কালি
জেনেছে ফুলমালি গোপনে॥

কাঁটার আড়ালে গোলাবের বাগে
ফুটায়েছে কুসুম কপট সোহাগে,
সে কুসুম-ঘেরা মেহেদির বেড়া,
প্রহরী ভোমোরা সে কাননে॥

ও পথে চোর-কাঁটা, সখি, তায় বলে দিও,
বেঁধে না বেঁধে না লো যেন তার উত্তরীয়!
এ বনফুল লাগি না আসে কাঁটা দলি,
আপনি যাব আমি বঁধুয়ার কুঞ্জ-গলি,
বিকাব বিনিমূলে ও-চরণে॥

২০

দুর্গা কাওয়ালি

নহে নহে প্রিয়, এ নয় আঁখি-জল।
মলিন হয়েছে ঘুমে চোখের কাজল॥

হেরিয়া নিশি-প্রভাতে
শিশির কমল-পাতে,
ভাবো বুঝি বেদনাতে
কেঁদেছে কমল॥

মরুতে চরণ ফেলে
কেন বন-মৃগ এলে,

সলিল চাহিতে পেলে
মরীচিকা-ছল॥

এ শুধু শীতের মেঘে
কপট কুয়াশা লেগে
ছলনা উঠেছে জেগে—
এ নহে বাদল॥

কেন কবি খালি খালি
হলি রে চোখের বালি,
কাঁদাতে গিয়া কাঁদালি
নিজেরে কেবল॥

২১

ভৈরবী—কাওয়ালি

এ আঁখি-জল মোছো পিয়া,
ভোলো ভোলো আমারে।
মনে কে গো রাখে তারে
ঝরে যে ফুল আঁধারে॥

ফোটা ফুলে ভরি ডালা
গাঁথো বালা মালিকা,
দলিত এ ফুল লয়ে
দেবে গো বলো কারে॥

স্বপনের স্মৃতি প্রিয়
জাগরণে ভুলিও,
ভুলে যেয়ো দিবালোকে
রাতের আলেয়ারে॥

ঝুরিয়া গেল যে মেঘ
রাতে তব আঙিনায়,
বৃথা তারে খোঁজো প্রাতে
দূর গগন-পারে॥

ঘুমায়েছ সুখে তুমি
সে কেঁদেছে জাগিয়া,
তুমি জাগিলে গো যবে
সে ঘুমায়ে ওপারে॥

আগুনে মিটালি তৃষা
কবি কোন্ অভিমানে,
উদিল নীরদ যবে
দূর বন-কিনারে॥

২২

ভৈরবী—পোস্তা

কি হবে জানিয়া বলো
কেন জল নয়নে।
তুমি তো ঘুমায়ে আছো
সুখে ফুল-শয়নে॥

তুমি কি বুঝিবা বালা
কুসুমে কীটের জ্বালা,
কারো গলে দোলে মালা
কেহ ঝরে পবনে॥

আকাশের আঁখি ভরি
কে জানে কেমন করি
শিশির পড়ে গো ঝরি
ঝরে বারি শাওনে॥

নিশীথে পাপিয়া পাখি
এমনি তো ওঠে ডাকি,
তেমনি ঝুরিছে আঁখি
বুঝি বা অকারণে॥

কে শুধায়, আঁধার চরে
চখা কেন কেঁদে মরে,

এমনি চাতক-তরে
মেঘ ঝুরে গগনে॥

কারে মন দিলি কবি,
এ যে রে পাষাণ ছবি,
এ শুধু রূপের রবি
নিশীথের স্বপনে॥

২৩

বিহারী—ঠুংরি

পরদেশী বঁধুয়া,
এলে কি এতদিনে।
আসিলে এতদিনে
কেমনে পথ চিনে॥

তোমারে খুঁজিয়া
কত রবি শশী
অস্ত হইল প্রিয়,
নিভিল তিমিরে
তব আশে আকাশ
তারা-দীপ জ্বালি
জাগিয়াছে নিশি
ঝুরিয়া শিশিরে!
শুকায়েছে স্বরগ,
দেবতা, তোমা বিনে॥

কত জনম ধরি
ছিলে বলো পাশরি,
এতদিনে বাঁশরি
বাজিল কি বিপিনে॥

নিতি ফুল-সনে
ফুটিয়া কাননে

ঝরিয়াছি সাঁঝে
নিরাশ হুতাশে,
নব নব গানে
বেদনা নিবেদন
করিয়াছে কবি,
প্রিয়, তব পাশে !
এলে আজি উদাসী
নিখিল-মন জিনে ॥

২৪

বেহাগ-খাম্বাজ—দাদ্‌রা

কেন উচাটন মন
পরান এমন করে।
কেন কাঁদে গো বধূ
ঝঁধুর বুকে বাসরে ॥

কেন মিলন-রাতে
মলিল আঁখি-পাতে,
কেন ফাগুন-প্রাতে
সহসা বাদল ঝরে ॥

ডাকিলে অনুরাগে
কেন বিদায় মাগে,
(কেন) মরিতে সাধ জাগে
পিয়ার বুকের 'পরে ॥

ডাকিয়া ফুলবনে
থাকে সে আনমনে,
কাঁদায়ে নিরজনে
কাঁদে সে কিসের তরে ॥

কবি, তোরে কে কবে
সাধিল বেণুর রবে,
ধরিতে গেলি যবে
বিঁধিল কুসুম-শরে ॥

২৫

সিন্ধু-ভৈরবী—কাহারবা

আসিলে এ ভাঙা ঘরে
কে মোর রাঙা অতিথি।
হরষে বরিষে বারি
শাওন-গগন তিতি॥

বকুল-বনের সাকি
নটীন পুবালি হাওয়া
বিলায় সুরভি সুরা,
মাতায় কানন-বীথি॥

বনের বেশর গাঁথে
কদম-কেশর ঝুরি,
শিশির-চুনির হারে
উজল উশীর-সিঁথি॥

তিতির শিখীর সাথে
নোটন-কপোতী নাচে,
ঝিঁঝির ঝিয়ারি গাহে
ঝুমুর কাজরী-গীতি॥

হিঙুল হিজল-তলে,
ডাহুক পিছল-আঁখি,
বধূর তমাল-চোখে
ঘনায় নিশীথ-ভীতি॥

তিমির-ময়ূর আজি
তারার পেখম খোলে,
জড়ায় গগন-গলে
চাঁদের ষোড়শী তিথি॥

মিলন-মালায় বাজে
গোপন মৃণাল-কাঁটা,
নয়ন-জলে কি করি
আঁকিস তাহারি স্মৃতি॥

২৬

কালাংড়া-বসন্ত-হিন্দোল—দাদ্‌রা

আজি দোল-পূর্ণিমাতে দুলবি তোরা আয়।
দখিনার দোল্ লেগেছে দোলন-চাঁপায়॥
দোলে আজ দোল্-ফাগুনে
ফুল-বাণ আঁখির তূণে,
দুলে আজ বিধুর হিয়া মধুর ব্যথায়॥

দুলে আজ শিথিল বেণী, দুলে বধূর মেখলা,
দুলে গো মালার পলা জড়াতে বঁধুর গলা।
মাধবীর দোলন্-লতায়
দোয়েলা দোল্ খেয়ে যায়,
দুলে যায় হল্‌দে পাখি সোঁদাল্-শাখায়॥

বিরহ-শীর্ণা নদীর আজিকে আঁখির কূলে
ভরে জল কানায় কানায় জোয়ারে উঠ্‌ল দুলে।
দুলে বসন্ত-রানি
কুসুমিতা বনানী
পলাশ রঙন দোলে নোটন-খোঁপায়॥

দোলে হিন্দোল-দোলায় ধরণী শ্যাম পিয়ারী,
দুলিছে গ্রহ তারা আলোক-গোপ-ঝিয়ারী।
নীলিমার কোলে বসি
দুলে কলঙ্কী-শশী,
দোলে ফুল-উর্বশী ফুল-দোলনায়॥

২৭

পিলু—দাদ্‌রা

রুমুঝুমু রুমুঝুম্
কে এলে নূপুর-পায়।
ফুটিল শাখে মুকুল
ও রাঙা চরণ-ঘায়॥

সে নাচে তটিনী-জল
টলমল টলমল,
বনের বেণী উতল
ফুলদল মুরছায়॥

বিজুরি জরির আঁচল
ঝলমল ঝলমল,
নামিল নভে বাদল
ছলছল বেদনায়॥

দুলিছে মেখলা-হার
শ্যামলী মেঘমালার,
উড়িছে অলক কার
অলকার ঝরোকায়॥

তালীবন থৈ তাথৈ
করতালি হানে ঐ
কবি, তোর তমালী কই—
শ্বসিছে পুবালি-বায়॥

২৮

সিন্ধু কাফি-খাম্বাজ—যৎ

আজি এ কুসুম-হার সহি কেমনে।
ঝরিল যে ধুলায় চির-অবহেলায়
কেন এ অবহেলায় পড়ে তারে মনে॥

তব তরে মালা গেঁথেছি নিরালা
সে ভরেছে ডালা নিতি নব ফুলে।
(আজি) তুমি এলে যবে বিপুল গরবে
সে শুধু নীরবে মিশাইল বনে॥

	আঁখি-জলে ভাসি	গাহিত উদাসী
	আমি শুধু হাসি	আসিয়াছি ফিরে।
(আজি)	সুখ-মধুমাসে	তুমি যবে পাশে
	সে কেন গো আসে	কাঁদাতে স্বপনে॥
	কার সুখ লাগি	রে কবি বিবাগী,
	সকল তেয়াগি	সাজিলি ভিখারি !
(তুই)	কার আঁখি-জলে	বেঁচে রবি বলে
	ফুলমালা দলে	লুকালি গহনে॥

২৯

মালকোষ—ত্রিতালী

গরজে গম্ভীর গগনে কম্বু।
নাচিছে সুন্দর নাচে স্বয়ম্ভু॥

সে নাচ-হিল্লোলে জটা-আবর্তনে
সাগর ছুটে আসে গগন-প্রাঙ্গণে।
আকাশে শূল হানি
শোনাও নব বাণী,
তরাসে কাঁপে প্রাণী
প্রসীদ শম্ভু॥

ললাট-শশী টলি জটায় পড়ে ঢলি,
সে-শশী-চমকে গো বিজুলি ওঠে ঝলি।
ঝাঁপে নীলাঞ্চলে মুখ দিগঙ্গনা,
মুরছে ভয়-ভীতা নিশি নিরঞ্জনা।
আঁধারে পথ-হারা
চাতকী কেঁদে সারা,
যাচিছে বারিধারা
ধরা নিরম্বু॥

৩০

হাম্বীর—কাওয়ালি

হাজার তারার হার হয়ে গো
দুলি আকাশ-বীণার গলে।
তমাল-ডালে ঝুলন ঝুলাই
নাচাই শিখী কদম-তলে॥

'বৌ কথা কও' বলে পাখি
করে যখন ডাকাডাকি,
ব্যথার বুকে চরণ রাখি
নামি বধূর নয়ন-জলে॥

ভয়ঙ্করের কঠিন আঁখি
আঁখির জলে করুণ করি,
নিঙাড়ি নিঙাড়ি চলি
আকাশ-বধূর নীলাম্বরী।

লুটাই নদীর বালুতটে,
সাধ করে যাই বধূর ঘটে,
সিনান-ঘাটের শিলা-পটে
ঝরি চরণ-ছোঁওয়ার ছলে॥

৩১

হাম্বীর—কাওয়ালি

অথীর অম্বরে গুরু গরজন মৃদঙ্ বাজে।
রুমু রুমু ঝুম্ মঞ্জীর-মালা চরণে আজ উতলা যে॥

এলোচুলে দুলে দুলে বন-পথে চল আলি
মরা গাঙে বালুচরে কাঁদে যথা বন-মরালী।
উগারি গাগরি ঝারি
দে লো দে করুণা ডারি,
ঘুঙট উতারি বারি
ছিটা লো গুমোট সাঁঝে॥

তালীবন হানে তালি, ময়ূরী ইশারা হানে,
আসন পেতেছে ধরা মাঠে মাঠে চারা-ধানে।

মুকুলে ঝরিয়া পড়ি আকূতি জানায় যুথি,
ডাকিছে বিরস শাখে তাপিতা চন্দনা তূতী।
কাজল-আঁখি রসিলি
চাহে খুলি ঝিলিমিলি,
চলো লো চলো সেহেলি,
নিয়ে মেঘ-নটরাজে॥

৩২

দেশ-সুরট—একতালা

ঝরে ঝরঝর কোন্ গভীর গোপন ধারা এ শাঙনে।
আজি রহিয়া রহিয়া গুমরায় হিয়া একা এ আঙনে॥

ঘনিমা ঘনায় ঝাউ-বীথিকায় বেণু-বন-ছায় রে,
ডাহুকিরে খুঁজি ডাহুক কাঁদে আঁধার গহনে॥

কেয়া-বনে দেয়া তূণীর বাঁধিয়া
গগনে গগনে ফেরে গো কাঁদিয়া।
বেতস-বিতানে নীপ-তরুতলে
শিখী নাচ ভোলে পুছ-পাখা টলে।

মালতী-লতায় এলাইয়া বেণী কাঁদে বিষাদিনী রে,
কাজল-আঁখি কে নয়ন মোছে তমাল-কাননে॥

৩৩

জয়জয়ন্তী—একতালা

হৃদয় যত নিষেধ হানে নয়ন ততই কাঁদে।
দূরে যত পলাতে চাই নিকট ততই বাঁধে॥

স্বপন-শেষে বিদায়-বেলায়
অলক কাহার জড়ায় গো পায়,
বিধুর কপোল স্মরণ আনায়
ভোরের করুণ চাঁদে॥

বাহির আমার পিছল হলো কাহার চোখের জলে।
স্মরণ ততই বারণ জানায় চরণ যত চলে।

পার হতে চাই মরণ-নদী
দাঁড়ায় কে গো দুয়ার রোধি,
আমায় ওগো বে-দরদী,
ফেলিলে কোন্ ফাঁদে॥

৩৪

কালাংড়া-ভৈরোঁ—আদ্ধা কাওয়ালি

শুকাল মিলন-মালা আমি তবে যাই।
কি যেন এ নদী-কূলে খুঁজিনু বৃথাই॥

রহিল আমার ব্যথা
দলিল কুসুমে গাঁথা,
ঝুরে বলে ঝরা পাতা—
নাই কেহ নাই॥
যে-বিরহে গ্রহতারা সৃজিল আলোক,
সে-বিরহে এ-জীবন জ্বলি পুণ্য হোক্।

চক্রবাক চক্রবাকী
করে যেমন ডাকাডাকি,
তেমনি এ কূলে থাকি
ও-কূলে তাকাই॥

৩৫

দরবারি কানাড়া—যৎ

স্মরণ-পারের ওগো প্রিয়, তোমায় আমি চিনি যেন।
তোমার চাঁদে চিনি আমি, তুমি আমার তারায় চেন॥

নতুন পরিচয়ের লাগি
তারায় তারায় থাকি জাগি,

বারেবারে মিলন মাগি
বারেবারে হারাই হেন॥

নতুন চোখের প্রদীপ জ্বালি চেয়ে আছি নিরিবিলি,
খোলো প্রিয় তোমার ধরার বাতায়নে ঝিলিমিলি।

নিবাও নিবু-নিবু বাতি,
ডাকে নতুন তারার সাথী,
ওগো আমার দিবস রাতি
কাঁদে বিদায়-কাঁদন কেন॥

৩৬

পিলু—কাহারবা

গহীন রাতে
ঘুম কে এলে ভাঙাতে।
ফুল-হার পরায়ে গলে
দিলে জল নয়ন-পাতে॥

যে জ্বালা পেনু জীবনে
ভুলেছি রাতে স্বপনে,
কে তুমি এসে গোপনে
ছুঁইলে সে বেদনাতে॥

যবে কেঁদেছি একাকী
কেন মুছালে না আঁখি,
নিশি আর নাহি বাকি
বাসি ফুল ঝরিবে প্রাতে॥

কেন এ কুহেলি ঠেলে
দখিনা বাতাস এলে,
কবি তুই হৃদয় মেলে
ছিলি কি এরি আশাতে॥

৩৭

সিন্ধু-কাওয়ালি

কোন্ শরতে পূর্ণিমা-চাঁদ আসিলে এ ধরাতল।
কে মথিল তব তরে কোন্ সে ব্যথার সিন্ধু-জল॥

দুয়ার-ভাঙা জাগল জোয়ার বেদনার ঐ দরিয়ায়।
আজ ভারতী অশ্রুমতী মধ্যে দুলে টলমল॥

কখন তোমার বাজল বেণু প্রাণের বংশী-বট-ছায়।
মরা গাঙের ভাঙা ঘাটে ঘট ভরে গোপিনীদল॥

বিদ্যুতের বাঁকা হাসি হাসিয়া কালো মেঘ,
আসিলে কে অভিমানী বহায়ে মরুতে ঢল॥

লয়ে হাতে জিয়ন-কাঠি আসিলে কে রূপ-কুমার
উঠল জেগে রূপ-কুমারী আঁধারে ঐ ঝলমল॥

আকাশে চকোরী কাঁদে, তড়াগে চাহে কুমুদ,
ঝরুক আঁখির শেফালিকা ছুঁয়ে তব পদতল॥

৩৮

ভীমপলশ্রী—দাদ্‌রা

জাগিলে 'পারুল' কিগো 'সাত ভাই চম্পা' ডাকে।
উদিলে চন্দ্র-লেখা বাদলের মেঘের ফাঁকে॥

চলিলে সাগর ঘুরে
অলকার মায়ার পুরে,
ফোটে ফুল নিত্য যথায়
জীবনের ফুল্ল-শাখে॥

আঁধারের বাতায়নে চাহে আজ লক্ষ তারা,
জাগিছে বন্দিনীরা, টুটে ঐ বন্ধ কারা।

থেকো না স্বর্গে ভুলে
এ পারের মর্ত কূলে,
ভিড়ায়ো সোনার তরী
আবার এই নদীর বাঁকে॥

৩৯

খাম্বাজ—আড়-খেম্‌টা

চরণ ফেলি গো মরণ-ছন্দে
মথিয়া চলি গো প্রাণ।
মর্তের মাটি মহীয়ান করি
স্বর্গেরে করি ম্লান॥

চিতার বিভূতি মাখিয়া গায়
লজ্জা হানি গো অন্নদায়,
বাঁধিয়াছি বিদ্যুল্লতায়,
দেবরাজ হতমান।
পাতাল ফুঁড়িয়া করি গো মাতাল
রসাতল-অভিযান॥

৪০

বৃন্দাবনী সারং—ঝাঁপতাল

নমো হে নমো যন্ত্রপতি নমো নমো অশান্ত।
তন্ত্রে তব ত্রস্ত ধরা, সৃষ্টি পথভ্রান্ত॥

বিশ্ব হল বস্তুময়
মন্ত্রে তব হে
নন্দন-আনন্দে তুমি
গ্রাসিলে মহাধ্বান্ত॥

শঙ্কর হে, সে কোন্ সতী-শোকে হয়ে নৃশংস
বসেছ ধ্যানে হয়েছ জড় সাধিতেছ এ ধ্বংস।

রুক্ষ তব দৃষ্টি-দাহে
শুষ্ক সব হে,
ভীষণ তব চক্রাঘাতে
নির্জ্জিত যুগান্ত॥

৪১

ভীমপলশ্রী—দাদ্‌রা

পুরবের তরুণ অরুণ
পুরবে আসলে ফিরে,
কাঁদায়ে মহাশ্বেতায়
হিমানীর শৈল-শিরে॥

কুহেলির পর্দা ডারি
ঘুমাত রূপ-কুমারী,
জাগালে স্বপনচারী
তাহারে নয়ন-নীরে॥

তোমার ঐ তরুণ গলার
শুনি গান সিন্ধু-পারে,
দুলিছ মধ্যমণি
সুরমার কণ্ঠ-হারে।

ধেয়ানী দিলে ধরা,
হলো সুর স্বয়ম্বরা,
এলে কি পাগল-ঝোরা
পাষাণের বক্ষ চিরে॥

৪২

দেশ—গীতঙ্গী

কে শিব-সুন্দর শরৎ-চাঁদ-চূড়
দাঁড়ালে আসিয়া এ অঙ্গনে।
পীড়িত নর-নারী আসিল গেহ ছাড়ি
ভরিল নভতল ক্রন্দনে॥

বেদনা-মন্দিরে আরতি বাজে তব,
কে তুমি সুন্দর শ্মশান-চারী নব,
দিগ্‌দিগন্তরে জীবন-উৎসব-
শঙ্খ শুনি তব আগমনে॥

মৃত্যু-জয়ী তুমি হওনি সুধা পিয়ে,
দুখেরে দহিয়াছ বিষের দাহ দিয়ে।
ভূষণ করি ফণি আদরে দিয়ে দোলা
কি মণি পেলে বলো ওগো ও চির-ভোলা!

কভু সে ডম্বরু বাজাও অম্বরে,
প্রলয়-নর্তন জাগে চরাচরে,
ললাট-জ্বালা-পাশে
চন্দ্র-লেখা হাসে
নবীন সৃষ্টির হরষণে॥

পতিতা গঙ্গারে ধরিলে নিজ শিরে,
কন্যারূপে তাই পেলে কি ভারতীরে,
স্বরগ এল নেমে মরতে তব প্রেমে,
নমামি দেব-দেব ও-চরণে॥

৪৩

গারা-ভৈরবী—কাহারবা

কার নিকুঞ্জে রাত কাটায়ে
আসলে প্রাতে পুষ্পচোর।
ডাকছে পাখি 'বৌ গো জাগো,
আর ঘুমায় না, রাত্রি ভোর'॥

জুঁই-কুঁড়িরা চোখ মেলে চায়,
চুমকুড়ি দেয় মৌমাছি।
শাপ্‌লা-বনে চাঁদ ডুবে যায়
ম্লান চোখে হায় চায় চকোর॥

ঘোম্‌টা ঠেলি কয় চামেলি,
গোল কোরো না গুল্‌-ডাকাত,
ঢুলছে নয়ন, দুলছে গলায়
বেল-টগরের ছিন্ন ডোর॥

বোরকা খুলি বন-কেতকীর
ফুলরেণুতে রাঙলে গা,
পারুল-বধূর মাগলে মধু,
হাস্‌নাহেনার ভাঙলে দোর॥

গায় কাওয়ালি বাদলি রুম্‌ঝুম,
তয়্‌ফাওয়ালি নাচে মউর্‌
ঝুরছে কদম, মেঘ-তমালে
বিজলি-চোখে চায় কিশোর॥

শোন্‌ রে কবি পুষ্পলোভী
আজ ধরেছি ফুল চুরি,
হুল ফুটিয়ে, ফুলবালাদের
কুল ভুলানো ভাঙবে তোর॥

৪৪

ভীমপলশ্রী—কাহারবা

কেন আনো ফুল-ডোর
আজি বিদায়-বেলা।
মোছো মোছো আঁখি-লোর
যদি ভাঙিল মেলা॥

কেন মেঘের স্বপন
আনো মরুর চোখে,
ভুলে দিয়ো না কুসুম
যারে দিয়েছ হেলা॥

আছে বাহুর বাঁধন
তব শয়ন-সাথী,

আমি এসেছি বাঁধন
আমি চলি একেলা॥

যবে শুকাল কানন
এলে বিধুর পাখি,
লয়ে কাঁটা-ভরা প্রাণ
একি নিঠুর খেলা॥

যদি আকাশ-কুসুম
পেলি চকিতে কবি,
চলো চলো মুসাফির,
ডাকে পারের ভেলা॥

৪৫

(রাতের) দুর্গা—আদ্ধা কাওয়ালি

কেমনে রাখি
আঁখি-বারি চাপিয়া।
প্রাতে কোকিল কাঁদে,
নিশীথে পাপিয়া॥

এ ভরা ভাদরে
আমার মরা নদী,
উথলি উথলি
উঠিছে নিরবধি।

আমার এ ভাঙা ঘটে
আমার এ হৃদিতটে
চাপিতে গেলে ওঠে
দু'কূল ছাপিয়া॥

নিষেধ নাহি মানে
আমার পোড়া আঁখি,
জল লুকাব কত
কাজল মাখি মাখি।

ছলনা করে হাসি
অমনি জলে ভাসি,
ছলিতে গিয়া আসি
ভয়েতে কাঁপিয়া॥

গাঁথিতে ফুলমালা
বিঁধে সে কাঁটা হয়ে,
কাঁটার হার গাঁথি—
সে আসে ফুল লয়ে।

কবি রে, জলধি এ
তাহারে মন দিয়ে
গেলি রে জল নিয়ে
জীবন ব্যাপিয়া॥

৪৬

(দিনের) দুর্গা—আদ্ধা কাওয়ালি

কেন আসিলে যদি যাবে চলি।
গাঁথিলে না মালা ছিঁড়ে ফুল-কলি॥

কেন বারেবারে আসিয়া দুয়ারে
ফিরে গেলে পারে কথা নাহি বলি॥

কি কথা বলিতে আসিয়া নিশীথে
শুধু ব্যথা-গীতে গেলে মোরে ছলি॥

প্রভাতের বায়ে কুসুম ফুটায়ে
নিশীথে লুকায়ে উড়ে গেল অলি॥

কবি শুধু জানে, কোন্ অভিমানে
চাহি যারে গানে কেন তারে দলি॥

৪৭

যোগিয়া—কাঁপতাল

সাজিয়াছ যোগী বলো কার লাগি
তরুণ বিবাগী॥

হেরো তব পায়ে
কাঁদিছে লুটায়ে
নিখিলের প্রিয়া
তব প্রেম মাগি
তরুণ বিবাগী॥

ফাল্গুন কাঁদে
দুয়ারে বিষাদে
খোলো দ্বার খোলো !
যোগী, যোগ ভোলো !

এত গীত হাসি
সব আজি বাসি,
উদাসী গো জাগো !
নব অনুরাগে
জাগো অনুরাগী
তরুণ বিবাগী॥

৪৮

বারোয়াঁ—কাহারবা

মুসাফির ! মোছ্ এ আঁখি-জল
ফিরে চল্ আপনারে নিয়া।
আপনি ফুটেছিল ফুল
গিয়াছে আপনি ঝরিয়া॥

রে পাগল ! এ কি দুরাশা,
জলে তুই বাঁধিবি বাসা !

মেটে না হেথায় পিয়াসা
হেথা নাই তৃষ্ণা-দরিয়া॥

বরষায় ফুটল না বকুল
পউষে ফুটবে কি সে ফুল,
এ দেশে ঝরে শুধু ভুল
নিরাশার কানন ভরিয়া॥

রে কবি, কতই দেয়ালি
জ্বালিলি তোর আলো জ্বালি,
এল না তোর বনমালি
আঁধার আজ তোরই দুনিয়া॥

৪৯

মন্দ্—কাহারবা

এ নহে বিলাস বন্ধু,
এ যে ব্যথা-রাঙা হৃদয়
ফুটেছি জলে কমল।
আঁখি-জলে টলমল॥

কোমল মৃণাল-দেহ
শরণ লয়েছি গো তাই
ভরেছে কণ্টক-ঘায়,
শীতল দিঘির জল॥

ডুবেছি এ কালো নীরে
শত ব্যথা ক্ষত লয়ে
কত যে জ্বালা সয়ে,
হইয়াছি শতদল॥

আমার বুকের কাঁদন
ফিরে যাও,
তুমি বলো ফুল-বাস,
ফেলো না গো শ্বাস
দখিনা বায়ু চপল॥

ফোটে যে কোন্ ক্ষত-মুখে
কবি রে তোর গীত-সুর,
সে ক্ষত দেখিল না কেউ,
দেখিল তোরে কেবল॥